ছোটগল্প

অরূপকথা

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

সাদিক হাঁক দিল, দু'টো চা দেবেন এদিকে।

হাসপাতালের বাইরে সার দেওয়া কয়েকটা চায়ের দোকান। বেশ রাত হয়ে গিয়েছে বলে প্রায় সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। শুধু একটা দোকান এখনও খোলা। দু'জন লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা লোক চায়ের গ্লাস হাতে বেঞ্চে বসে নিজেদের মধ্যে নীচুস্বরে কথা বলছে। মহিলা দোকানি মুখ তুলে সসম্ভ্রমে বলল, এই দিচ্ছি ডাক্তারবাবু।

একটা হ্যালোজেন জ্বলছে। হলদে আলো তেরচা হয়ে এসে পড়েছে বেঞ্চে বসা হলদে শাড়ি পরা রুমকিদির উপর। রুমকিদি গলাটা ঈষৎ তুলে বলল, একটা চিনি ছাড়া দেবেন।

সাদিক ভুরু কোঁচকাল, চিনি ছাড়া কেন? তোমার সুগার ধরেছে নাকি?

–বর্ডার লাইন ছাড়িয়েছে। আজকাল মিষ্টি অ্যাভয়েড করি।

সাদিক ডাক্তারসুলভ গলায় বলল, সকালে উঠে আধঘণ্টা হাঁটতে পারো তো।

–তুইও পারিস। সারাদিন দম ফেলার সময় পাই না তার আবার মর্নিংওয়াক!

–কী এমন রাজকার্য করো সারাদিন?

–আমার কাজের ফিরিস্তি শুনলে বোর হয়ে যাবি। ভোরবেলা উঠে একটা ব্যাচ পড়াই। মা মারা যাওয়ার পর বাবা আরও বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ লোকটাকে তো আর বাজারে পাঠাতে পারি না। স্টুডেন্টদের ছুটি দিয়ে নিজেই দৌড়োই বাজারে। বাজার এনে যা হোক কিছু রান্না করি। স্নান সেরে বাবাকে ওষুধ খাইয়ে নাকেমুখে গুঁজে স্কুলে যাই। বিকেল থেকে আবার টোল শুরু। স্টুডেন্টরা চলে যাওয়ার পর রাতের ভাতটুকু করে নিই। বাবাকে খাইয়ে নিজে খেতে খেতে বেশ রাত হয়ে যায়। তারপর খবরের কাগজটা দেখি। গল্পের বই–টই পড়ি। সারাদিনে ওটুকু সময়ই তো নিজের জন্য বরাদ্দ। রোজই শুতে শুতে একটা–দেড়টা বেজে যায়।

–এতগুলো টিউশন না করলেই কি চলছে না তোমার?

–তুই তো সবই জানিস সাদিক। বাবা চিটফান্ডের এজেন্ট ছিল। সেই কোম্পানি ডুবে গেল। কর্তারা চম্পট দিল শহর ছেড়ে। বাবা যে সব লোককে ইনভেস্ট করিয়েছিল তারা চড়াও হল বাড়িতে। মায়ের বিয়ের গয়নার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে সেই টাকা শোধ দিতে হয়েছিল। আমাদের বাড়িটাও বন্ধক দিয়েছিল বাবা। সেই ধার এখনও শোধ হয়নি। আমার মাইনের পুরোটাই পুরোনো দেনা মেটাতে চলে যায়। টিউশনি না করে উপায় কী বল।

চা এসে গিয়েছে। রুমকিদি চায়ের গ্লাস হাতে নিল। মুখটা তুলে বলল, বাবাকে কেমন বুঝছিস? এ যাত্রা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব?

সাদিক বলল, আশি বছরের বৃদ্ধ মানুষ, হাঁপানির টান বেড়ে গিয়েছে। ইঞ্জেকশন দিয়ে, নেবুলাইজ করে রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। কাল অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে ভেন্টিলেটরে ঢোকাতে হয়েছিল। এখন অবশ্য একটু স্টেবল।

রুমকিদি চায়ে চুমুক দিচ্ছে চুপচাপ। একটুক্ষণ পর মুখ তুলল। ম্লান হেসে বলল, বেশ একটা ভারিক্কি ভারিক্কি ভাব এসেছে তোর মধ্যে। অথচ আগে তুই কী ইমোশনাল ছিলি ভাবি! ঝুমকির গায়ে হলুদের দিন ছেলেমানুষের মতো কীভাবে কেঁদেছিলি তোর মনে আছে?

সাদিক একটু লজ্জা পেল, তখন আমি ডাক্তারি ছাত্র। বয়স কম। ঝুমকির বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে মাথাটা টলে গিয়েছিল। নইলে বিয়ের কার্ড ছাপানো হয়ে যাওয়ার পরদিন কেউ প্রেমিকাকে জীবনের প্রথম চিঠিটা লেখে! আর কপাল এমন, পড়বি তো পড় সেই চিঠি আবার গিয়ে পড়ে তার দিদিরই হাতে!

রুমকিদি বলল, ওর পড়ার টেবিলে চিঠিটা আমার চোখ পড়ে গিয়েছিল। তোরা যে এতটা এগিয়েছিস সেটা বলবি তো একবার! ঝুমকি বরাবরই চাপা স্বভাবের। ঝুমকিও বলেনি।

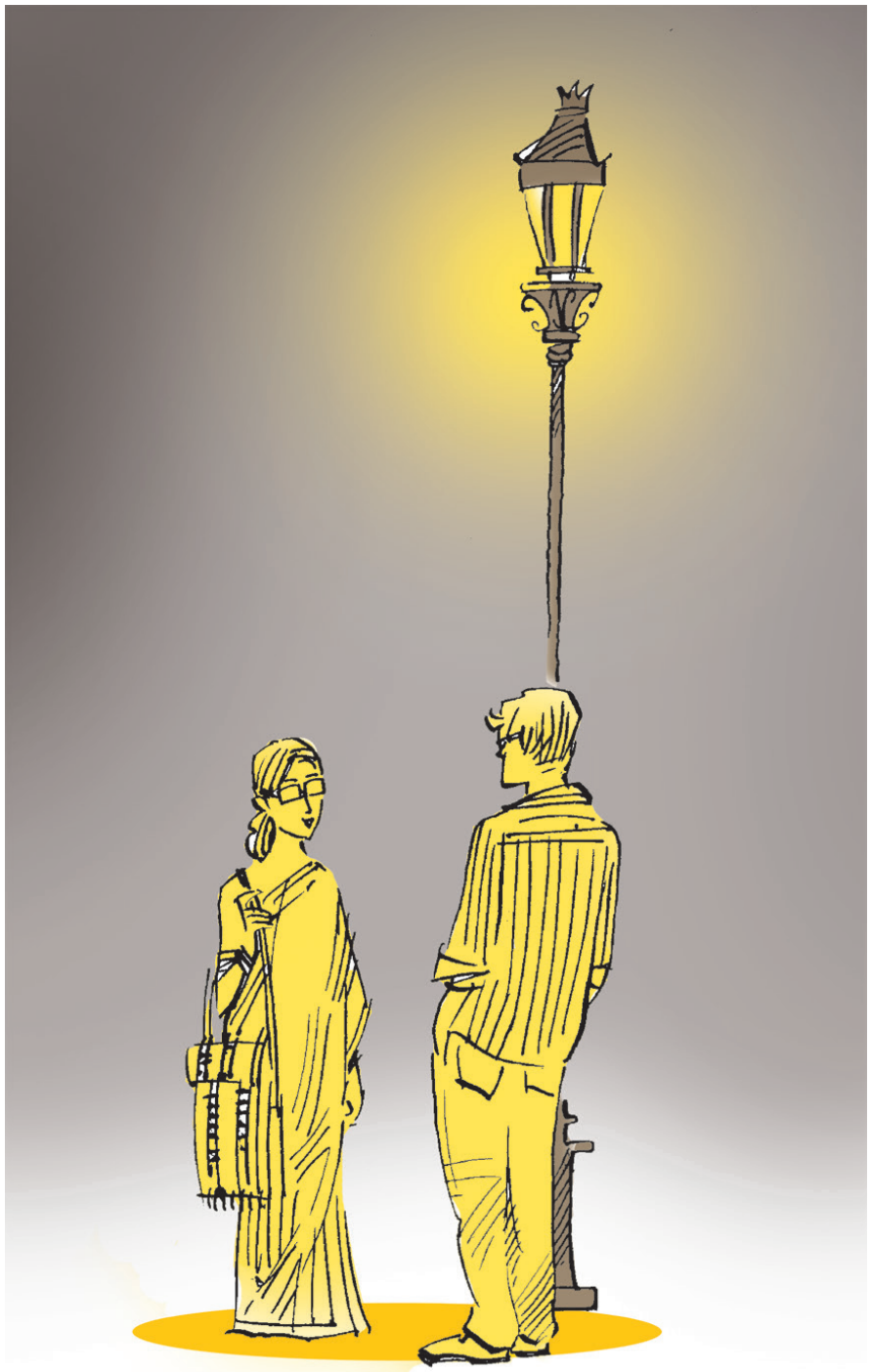

সাদিক বলল, বললে কী হত! তোমরা গোঁড়া বামুন। অন্য ধর্মের ছেলের সঙ্গে ঝুমকির বিয়ে দিতে পারতে তোমরা?

রুমকিদি বলল, বলে তো দেখতিস। এক পাড়ায় আমাদের বাড়ি। তোদের বাড়িতে আমাদের ছোটবেলা থেকে যাতায়াত। তুইও তো আমাদের বাড়িতে কত এসেছিস। তোর ঠাকুরদা স্বাধীনতা আন্দোলনে জেল খেটেছিলেন। এই মফস্‌সল শহরে তোদের সকলে চেনে। আমার বাবা–মা তেমন অর্থোডক্স নয়। বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই মানত।

সাদিক বলল, সাহস পাইনি। তখন সত্যিই আমি ভিতুর ডিম ছিলাম। এখন যেমন হাঁ হয়ে যাওয়া ক্ষত অবলীলায় স্টিচ করতে পারি তখন পারতাম না। হাত কাঁপত। এখন সুগারের পেশেন্টের পচে যাওয়া পা থেকে বিনা দ্বিধায় লার্ভা টেনে বের করতে পারি। মাইক্রোস্কোপের তলায় নিজের এক ফোঁটা রক্ত দিতে গিয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলতাম তখন।

–ঝুমকি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল বিষ খাবে কিন্তু তোকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। তখন কার্ড ছাপা হয়ে গিয়েছে। আমাদের অবস্থা ভাব একবার। ওকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিয়েতে রাজি করালাম। তখন কে জানত যে বেশিদিন ওর আয়ু নেই। শেষ কথাটা বলার সময় ডুকরে উঠল রুমকিদি।

সাদিক বলল, ঝুমকির ঘটনাটা এতটাই আকস্মিক যে আমি শোনার পর পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। একটা সদ্য বিয়ে হওয়া মেয়ে, কত স্বপ্ন, বিরাট আকাশে ঘুড়ির মতো উড়ছে জীবন, কিন্তু সেই আকাশে এমন কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে কে জানত!

রুমকিদি বলল, একদিন ও লক্ষ করেছিল ওর ডানদিকের বুকে একটা লাম্প। দিন কয়েকের মধ্যেই সেটা একটা রক্ত–পুঁজ মাখা টেনিস বলের মতো বেড়ে ওঠে। অঙ্কোলজিস্ট বলেছিলেন ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে। জ্বর আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে ও ভর্তি হয়েছিল এই হাসপাতালে।

সাদিক বলল, অঙ্কোলজিস্টের সঙ্গে আমিও ওটিতে ছিলাম। ওর মাংসপিণ্ডটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বুকে অনেকটা জল জমেছিল, সেটাও বার করা হয়েছিল। কিন্তু তিনদিনের মাথায় শ্বাসকষ্ট ফিরে এল। আবার জল জমে গেল বুকে। বায়োপসি রিপোর্ট হাতে এল। দেখলাম, সারকোমা। বাজে ধরনের ব্রেস্ট ক্যানসার।

রুমকিদি বলল, আমি আর মা ঝুমকির বেডের পাশে বসে ওকে বলতাম, আর দু'সপ্তাহ, তারপরেই বাড়ি নিয়ে যাব। ঝুমকি হাসত। নিস্তেজ একটা হাসি। আমাদের উপর আস্থা ছিল ওর। কিন্তু খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে থাকা শরীর ওকে জানান দিচ্ছিল যে আর বেশিদিন নয়। আশা আর আশঙ্কা লুকোচুরি খেলত ওর মুখে।

সাদিক বলল, ওর তখন প্যালিয়েটিভ কেমো চলছিল। ঝুমকি নিস্তেজ হচ্ছিল ক্রমশ। শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছিল। বাড়ছিল শ্বাসকষ্ট।

রুমকিদি শ্রান্ত গলায় বলল, ঝুমকির যে আয়ু ফুরিয়ে এসেছে সেটা একদিন ডেকে বুঝিয়ে বলেছিলি আমাকে। কিন্তু যুক্তি–বুদ্ধি ছেড়ে ভালোবাসা দিয়ে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিলাম ঝুমকিকে। ক্যানসার বড় শক্ত প্রতিপক্ষ। আমাদের আবেগ পারল না তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

মশা বিনবিন করছে। একটা মশা তাড়িয়ে রুমকিদি বলল, তোর দিদির মেয়েটার কী যেন নাম? ফরজানা, তাই না? কী মিষ্টি দেখতে ছিল বাচ্চাটা! বারবি ডলের মতো ঢেউ খেলানো চুল, দুষ্টু দুষ্টু হাসি, কালো চকচকে চোখের মণি, আধো আধো বুলি। কী করে যে ওর এমন একটা অসুখ করল! ফরজানা যেদিন চলে গেল সেদিন আমি মুখে ভাত তুলতে পারিনি।

সাদিক মৃদু স্বরে বলল, অ্যাকিউট লিউকোমিয়া

সাদিক বলল, সাহস পাইনি। তখন সত্যিই আমি ভিতুর ডিম ছিলাম। এখন যেমন হাঁ হয়ে যাওয়া ক্ষত অবলীলায় স্টিচ করতে পারি তখন পারতাম না। হাত কাঁপত। এখন সুগারের পেশেন্টের পচে যাওয়া পা থেকে বিনা দ্বিধায় লার্ভা টেনে বের করতে পারি। মাইক্রোস্কোপের তলায় নিজের এক ফোঁটা রক্ত দিতে গিয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলতাম তখন